কিছুটা কৈফিয়তের সুরে

প্রকাশক কত ছেপেছিলেন জানি না, কিন্তু ছ-সাত মাসের মধ্যেই যে বইটির প্রথম সংস্করণ এমনিভাবে ফুরিয়ে যাবে তেমন ধারণা আমার দূর কল্পনাতেও ছিল না। নিজের দুরদর্শিতায় মুগ্ধ হলেও সম্ভবত প্রকাশকও হতবাক। তবু দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশে তারপর থেকে কেন যে আরো আট-ন বছর পেরিয়ে গেল, সে এক বেনজির দৃষ্টান্ত।

খানিকটা দোষ আমারও ছিল বলতে পারেন। কেননা আমার অভিলাষ হয়েছিল দ্বিতীয় সংস্করণটি 'থীমা' প্রকাশনা থেকে বের হোক। শ্রীযুক্ত শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি সেই প্রকাশনার অন্যতম কর্ণধার, তাঁরও উৎসাহ আর আগ্রহ ছিল ঢের। 'পুস্তক বিপণি'কে সে জন্যে আর পুনর্মুদ্রণের অনুমতিও দেওয়া হল না। তারপর থেকে অনেক বার ছাপার উদ্যোগ হয়েছে, তবে মূল পরিকল্পক শমীকের আন্তর্জাতিক ব্যস্ততার ধাক্কায় বারেবারেই সেই সব প্রচেষ্টার ঢেউ সময়ের স্রোতে মিলিয়ে গেছে। বিগত বছরগুলো এইভাবেই কখন যেন গড়িয়ে গেল নিঃশব্দে।

শ্রীযুক্ত প্রিয়ব্রত দেব আদ্যন্ত সুরুচিবান সুভদ্র মানুষ। 'প্রতিক্ষণ' নামের একটি অভিজাত প্রকাশনার স্বত্বাধিকারী। একদিন তাঁর তরফ থেকে বইটি পুনর্মুদ্রণের আকস্মিক প্রস্তাব এলো। শমীকের কানেও পৌঁছোল খবরটা। আমার মতো তিনিও যেন তাতে বেশ আশ্বস্ত হলেন।

আসলে দ্বিতীয় সংস্করণটি ঘিরে শমীকের সব অভিনব পরিকল্পনা ছিল। হাজার ইচ্ছা সত্ত্বেও বিপুল কাজের চাপে তাকে মনের মতো সাজিয়ে নেবার সময় বের করতে পারছিলেন না। অথচ নিরর্থক সময় নষ্ট হবার ফলে অসহনীয় অস্বস্তি তাঁকে তাড়না করছিল ভিতরে ভিতরে। এমন সময় প্রিয়ব্রতর প্রস্তাবে যে সর্বস্বস্তি নামবে তেমনটাই তো স্বাভাবিক। প্রতিক্ষণের মতো এক সম্ভ্রান্ত প্রকাশনা, যার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে শমীকেরও দৃঢ় সংযোগ, তাঁর এতকালের লালিত ভাবনাটি তিনি তখন দাখিল করলেন সেখানে এবং প্রিয়ব্রতও তার উপরে তাঁর সমর্থনের শিলমোহরটি বসিয়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে। ফলে পুনর্মুদ্রণ নয়, শেষ পর্যন্ত একটি দৃষ্টিনন্দন নব সংস্করণের সিদ্ধান্ত নিতে দুজনের আর সময় লাগল না মুহূর্তকাল। আর আমিও শমীকের পরিকল্পনা অনুসারে নতুন সংযোজনায় মনোযোগী হলাম।

লক্ষ্য ছিল অবশ্য ২০১০-এর বইমেলাতে বইটি প্রকাশ করার। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে দেখা গেল শমীকের পরিকল্পনাকে সম্মান জানাতে গেলে নির্ধারিত সময়কে মান্য করা চলে না। এমনিতেই যখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে তখন তাঁর চাহিদা অনুযায়ী সংস্করণটি সাজাবার জন্যে আরো কিছু সময় বরাদ্দ করা সাব্যস্ত হল।

প্র বা হ এ ক

সব গল্পেরই একটা ধরতাই থাকে। ভরন্ত লাটাইয়ের মতো তা থেকে আলতো হাতে সুতো ছাড়তে পারলে গল্পের ঘুড়িটা কিন্তু আকাশবিহঙ্গী। তখন তাকে ইচ্ছেমতো হুকুম কর, মর্জিমাফিক পাকসাট খাইয়ে শূন্যে ভাসাও, ভোকাট্টা হবার আগে পর্যন্ত সে আজব মাদারি খেলোয়াড়। উলটেপালটে নানান কিসিমের খেলা দেখিয়ে যাবে সারাক্ষণ।

এমনি হালকা-পলকা চালে চলতে চলতেই মানুষ, মানুষের জীবন, জীবনের কথা, গান, সব কিছুই তো একসময়ে গল্প-গাথা হয়ে যায়। তখন দূর থেকে সেই গল্পকে আকাশচারী মনে হলেও তার মূল সুতোটা থেকে যায় কিন্তু বাস্তবের মাটিতে। সেই লাটাই থেকেই তখন চলে টানাপোড়েন। সেখানেই লুকোনো থাকে তার কেরামতির কলকাঠি। আসলে বর্তমানের সঙ্গে ইতিহাসের তো তেমন ঘরবসতি নেই। সব কটি ব্যঞ্জনই সাজিয়ে দেওয়া থাকে তার অতীতের বাটিতে। সেখান থেকে তুলে এনে বর্তমানের থালায় গোছগাছ করে বেড়ে দিতে পারাটাই গল্প।

মানুষের জীবন নিয়ে কিছু বলতে গেলে, তা সে নিজেরই হোক কিংবা অন্যের, সফল হোক কী অসার্থক, পরিপার্শ্ব ছুঁয়ে না গেলে তা সঠিক অবয়ব পায় না। সময় আর পরিবেশের দাক্ষিণ্য নিয়ে জীবনের মাটি থেকে রসপান করেই তো মানুষকে ঋদ্ধ হতে হয়, পুষ্ট হতে হয়—তা সেই জীবন বনসাইয়ের মতো খর্ব হয়ে থাকলেও চাওয়া-পাওয়ার ছুটকোছাটকা আভাস তাতে যেটুকু মেলে, পশ্চাৎপট হিসেবে তখন কিছুটা পিছনে না হাঁটলে সেটি ধরিয়ে দেবার উপায় নেই।

কেমন করে শুরু করব, ঠিক কোনখান থেকে, বুঝতে পারছি না। এ তো ঠিক আত্মজীবনী নয়, আবার আত্মজৈবনিক কিছু ঘটনাও যে এর মধ্যে থেকে যাচ্ছে তাও কি অস্বীকার করতে পারব? সে সব কথা তখন কীভাবে বলব আর কতটা নয়—ঠিক কোন ঘাটে থামলে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে না, সেটাই ঠাওর করা কঠিন হয়ে পড়ছে।

সত্যি বলতে কী, জাহির করার মতো এমন কিছু তো আমার জীবনে ঘটেনি যা সাতকাহন করে আপনাদের সমীপে হাজির করা যায়। নাট্যকলাকে ভালোবাসি, ভালোমন্দ যেমন পারি তাকে নিয়েই তো কাটিয়ে দিলাম জীবনের এতগুলো বচ্ছর। পাওয়া না পাওয়ার হিসেবনিকেশ নয়। এ গল্প আসলে জলের আয়নায় নিজের মুখ দেখা। উঠোনে মেলে দেওয়া জীবনের আহরিত ফসল যখন খুটে খায় স্মৃতির পাখি—কতক্ষণ সে রইবে আর কখন উড়াল দেবে সে সবই তার মর্জি। একলা হলে মানুষের মনে তো এমনি কত পুরোনো রঙচটা ছবিই ভেসে ওঠে, আবার ডুবেও যায়। এ সবই হল চিরন্তনের সেই পানকৌড়ি খেলা—যেন ডুবসাঁতারে খানিক দূর গিয়ে দম নিতে জলের উপরে আবার মুখ ভাসানো। নতুন কিছু নয়।

আমার মা শৈলবালা। বাবার নাম মনমোহন ঘোষদস্তিদার।

আমাদের চার ভাইবোনের মধ্যে সবার শেষে আমি। আর ছিলেন আমাদের এক ঠাকুমা। বাবার মামিমা তিনি।

আসলে বাবা তাঁর মাকে হারিয়েছিলেন এক মাস বয়সে। এই মামিমাই তারপর থেকে তাঁর মা—মায়ের চেয়েও ঢের বেশি। একুশ বছর বয়সের সেই নিঃসন্তান বিধবা প্রায় সদ্যোজাত একটি শিশুকে বুকের কাছে পেয়ে যেন বেঁচে গেলেন। এই কজনকে ঘিরেই আমাদের ছোট্ট সংসার।

আমাদের সেই ঠাকুমারা শুনেছি পূর্বপুরুষের সূত্রে ছিলেন রাজা প্রতাপাদিত্য, নাকি তাঁর খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায়-পরিবারের বংশধর। গুহরায়চৌধুরী পদবিধারী। যদিও একখানা মরচেধরা তলোয়ার ছাড়া সেই রাজপরিবারের কোনো স্মারক চিহ্নই দেখতে পাইনি সেই সংসারে। তবু তাঁদের বসতবাটির এলাকাটি রাজবাড়ি নামেই পরিচিত ছিল।

পিতৃনিবাস অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলার 'গাভা' গ্রামে। তবে ওটি জন্মস্থান নয় আমার। ওই গ্রামটি নিয়ে শুনেছি একটি মজার জনশ্রুতি আছে। সেটি হল : এই 'ঘোষদস্তিদার' পদবিধারীরা নাকি ওই গাভা গ্রামে ছাড়া আর কোথাও জন্মান না। মানে পৃথিবীর যেখানে যত ঘোষদস্তিদারের হদিশ পাওয়া যাচ্ছে, পিতৃপুরুষের সূত্রে তাঁরা নাকি আদিতে ওই গাঁয়েরই বাসিন্দা ছিলেন। শোনা যায় রামকৃষ্ণ ঘোষ নামের জনৈক বঙ্গসন্তান নাকি বাদশাহ জাহাঙ্গীরের দরবারে যাবতীয় দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন। সেই সূত্রেই তাঁর দরবারি খেতাব ওই 'দস্তিদার' উপাধিপ্রাপ্তি। কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে এই গাভা গ্রামেই নাকি বসতি গড়েছিলেন ভদ্রলোক। তাঁর সেই বংশবৃক্ষেরই ফলে-ফুলে পরবর্তীকালে এই গ্রাম শোভিত ও সমৃদ্ধ।

অবিশ্যি এমনি অন্য একটি গ্রামের খবরও পাওয়া যায় এই বরিশালেই। তার নাম বানরিপাড়া। যাবতীয় গুহঠাকুরতাদের যেটি নাকি আদি বাসভূমি। এমন পদবিভূষিত গ্রাম বাংলাদেশের আর কোথাও রয়েছে বলে শুনিনি।

গাভা গ্রামে পৈতৃক বাস হলেও আমার মনে তার তেমন কোনো স্মৃতি নেই। অতি শিশুকালে দেখা আমাদের বাসগৃহের সেই প্রাচীন অট্টালিকাটি শুনেছি এখনও টিকে রয়েছে স্থানীয় কিছু মানুষজনের দখলদারিতে। 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু' তত্ত্বটি সার মেনে তাঁরাই বসবাস করেন সেখানে।